The Faculty Journal of Arts, Rajshahi University
Volume 40, December 2025, ISSN 1813-0402

প্রাচীনকালে পুঁথিকরদের লেখা পুঁথি পরিচিতি ও এর গুরুত্ব

[Introduction and Importance of manuscripts written By the scribe of ancient times]

Dr. Sherina Sultana
Professor, Department of Sanskrit, University of Rajshahi, Rajshahi-6205, Bangladesh

ARTICLE INFORMATION

The Faculty Journal of Arts
Rajshahi University
Volume 40, December 2025
ISSN: 1813-0402 (Print)

DOI:

Received : 28 May 2025
Received in revised: 01 March 2026
Accepted: 17 February 2026
Published: 15 April 2026

Keywords: Manuscript, Composition, Materials, Preservation, Importance Ancient, Heritage.

ABSTRACT

The Varendra Research Museum houses a huge collections of antiquities including a huge number of manuscripts more than six thousands dating back from 11th to 18 Century A.D. These Mss. are obviously very important and magnificent in our history and heritage. The modern age in the history of Bengali literature began in 1801 A.D. The advent of printing technology marks the beginning of the modern era in this region. The period before the establishment of printing presses is referred to as the age of manu scripts. This is because, at that time, manuscripts were the only medium of preserving literary works. The poems and writings of poets and authors of that era were preserved in handwritten manuscripts. One or multiple copies were made form original manuscripts, and later, those copies were spread further. In this way, manuscripts of literary works were passed down across regions. However, literature was not the only purpose of manuscripts-they were also used for religion, governance, economics, and daily communication. In that era, manuscripts were the main tool of cultural and educational expression. In this chapter, an overview of manuscripts, their types, and topics such as materials, structure, and illustrations have been discussed.

ভূমিকা

প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যের প্রধান বাহন পুঁথি বা পাণ্ডুলিপি। এই অঞ্চলে মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত পুঁথির বেশ কদর ছিল। শাস্ত্রবিদ, বৈয়াকরণিক, চিকিৎসক, কবি সাহিত্যিক সকলেই নিজের রচনা হাতে লিখে রাখতেন। শিক্ষার্থী, শিক্ষক-গবেষক তাঁদের প্রয়োজনীয় সকল বিষয় হাতে লিখে রাখতেন। এভাবে হাজার হাজার গ্রন্থ নকল করে রাখায় সারাদেশে তা ছড়িয়ে পড়তো। এ সময়ে একদল মানুষ পুঁথি নকল করাকে পেশা হিসেবে বেছে নেন। স্বল্প শিক্ষিত অসংখ্য মানুষ, যাদের হাতের লেখা সুন্দর তাঁরাও পুঁথি নকল করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। প্রাচীন সাহিত্যের যে-সব নিদর্শন পাওয়া যায় তা সবই হাতে লেখা। এই সাহিত্যকৃতি যুগানুসারে বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। প্রাচীন যুগে প্রচলিত পুস্তক শব্দের উৎপত্তি পোস্ত বা পুস্ত শব্দ থেকে। পোস্ত শব্দের অর্থ চামড়া। প্রাচীন যুগের সাহিত্য নিদর্শন পোস্ত এর উপর লেখা হতো বলে একে পুস্তক বলা হতো। সংস্কৃত পুস্তক শব্দ থেকে উদ্ভূত হয় পুঁথি শব্দ। মধ্যযুগের পুঁথি প্রাচীনযুগের পুস্তকের নামান্তর। পুঁথি এবং পুস্তক শব্দ সমার্থক। বেদ থেকে শুরু করে *ব্রাহ্মণ*, *আরণ্যক*, *উপনিষদ*, *রামায়ণ*, *মহাভারত* নাটককে অবলম্বন করে রচিত সাহিত্যকৃতিকে বলা হয় পুঁথি। পুস্তকের অপর নাম গ্রন্থ। গ্রন্থ শব্দ থেকে গ্রন্থি শব্দের উৎপত্তি। পুঁথির মধ্যভাগে ছিন্ন করে দড়ি দিয়ে একে গ্রন্থিবদ্ধ করে আঁটসাঁট ভাবে বাঁধা হতো বলে এর নাম গ্রন্থি। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে পুঁথি শব্দ ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। পুঁথি শব্দের মূল যে অর্থ 'হস্তলিখিত প্রাচীন গ্রন্থ' তা থেকে মধ্যযুগের শেষভাগে বাবহৃত পুঁথি শব্দের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান রয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত পুঁথি শব্দ এরূপ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। পরবর্তী সময় থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ব্যাপক অর্থে অর্থাৎ হস্তলিখিত যে-কোনো প্রাচীন গ্রন্থই পুঁথি শব্দরূপে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। পাণ্ডুলিপি পুঁথি শব্দের প্রতিশব্দ রূপে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে পণ্ড+উ-কর্মবাচ্যে- অর্থ শুক্লপীতবর্ণ বা ধূসরবর্ণ লিপি লিপ্ ই কর্মবাচ্যে-লিখিত পত্রাদি। অধিকাংশ বস্তুই দীর্ঘদিনের ব্যবধানে পাণ্ডু বা ধূসর বর্ণ ধারণ করে।

উপকরণ

সুদূর প্রাচীন যুগে পশুচর্ম, ভূর্জপত্র, তালপত্র, গাছের বাকল প্রভৃতি বস্তু লেখার উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হতো। লেখার উপযোগী হিসেবে তৈরি করতে প্রথমে এই সব উপাদান সম্পূর্ণরূপেই পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করত। পাণ্ডুবর্ণ গ্রন্থের অনুকরণে বা প্রভাবে লেখার উপাদান হিসেবে হাতে তৈরী তুলট কাগজের রঙ পাণ্ডুবর্ণের করা হতো। পাণ্ডু বর্ণের উপাদানে লিখিত হতো বলে একে পাণ্ডুলিপি বলা হতো।

পাণ্ডুলিপি শব্দটি Manuscript অর্থে এদেশে ইংরেজ আগমনের পর থেকেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ইংরেজিতে Manuscript শব্দের অর্থ হস্তলিখিত গ্রন্থ বা দলিল অথবা ছাপানোর জন্য হস্তলিখিত টাইপ করা লিপি অর্থাৎ পাণ্ডুলিপি। ভারতীয় পাণ্ডুলিপির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পাণ্ডুবর্ণের উপাদানে লেখা না হলেও তা পাণ্ডুলিপি। পাণ্ডুবর্ণের উপাদানে লিখিত গ্রন্থকে পাণ্ডুলিপি বলা হয়।

ইংরেজি Manuscript শব্দের অর্থানুসারে ছাপানোর উপযোগী করে তৈরি করা লেখকের হাতে লেখা অথবা টাইপ করা খসড়াকেও পাণ্ডুলিপি বলা হয়। যে-কোনো প্রাচীন গ্রন্থ দলিল পত্রাদি সবই পাণ্ডুলিপি নামে পরিচিত। পুঁথি ও পাণ্ডুলিপি শব্দ দুটি বর্তমানে ভিন্নার্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। পুঁথি শব্দের মূল অর্থ হস্তলিখিত প্রাচীন পুস্তক আর পাণ্ডুলিপি শব্দের অর্থ পাণ্ডু বা ধূসর বর্ণের উপাদানে হস্তলিখিত লিপি। বর্তমানে দুটি শব্দ একই অর্থে প্রতিশব্দ রূপে ব্যবহৃত হচ্ছে। হাতে লেখা যে-কোনো প্রাচীন গ্রন্থকেই এখন পুঁথি বা পাণ্ডুলিপি বলে ধরে নেয়া যায়। বাঙ্গালা পুঁথির কথা প্রসঙ্গে শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল বলেছেন,

> "এদেশে ছাপাখানা বসিবার আগে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ সজ্জনেরা নিজেদের চৌপাড়িতে বিশাশয় বা ততোধিক পড়ুয়াদের পঠন পাঠনেই সগৌরবে ব্যাপৃত থাকিতেন। পড়ুয়াদের খুঙ্গিতে থাকিত অমর, জুমর, মাঘ, নৈবধ, রঘু, পিঙ্গল, রামায়ণ প্রভৃদির হাতে লেখা পুঁথি। মসজিদ, মক্তব, মাদ্রাসাতে এবং সাধারণ ভদ্র মুসলমানের বাড়িতে থাকিত কোরাণ, কালাম, কেচ্ছা, বয়েতের পুঁথি নস্‌ধ্‌, নস্তালিফ কিংবা শিকস্তা হাতে লেখা এই সকল হাতে লেখা পুঁথির নকল হইতে নকলে দেশের সর্বত্র ব্যাপ্তি ছিল। প্রথম যুগের ইংরেজরাও এদেশে হাতে লেখা পুঁথিই কাজে লাগাইতেন। তখন প্রত্যেক ভদ্রঘরে ধর্ম অথবা কাম, মোক্ষ সাধনার জন্য পুঁথি রাখা ছিল অপরিহার্য্য। এই সকল পুঁথি নকল করা ছিল তখনকার দিনের এক প্রধান পেশা। হস্তাক্ষর ভালো হইলে স্ত্রীলোক, বালক, বৃদ্ধ জাতিধর্ম নির্বিশেষে এই পেশা গ্রহণ করিতেন। শর, শকুনের পালক, কঞ্চি বা লোহার কলম দিয়া বড়ো এবং পোক্ত ছাঁদে বিশেষ প্রকার কালির দ্বারা সাধারনতঃ তুলোট কাগজের লম্বা ফর্দে বা তালপত্রে এই সকল পুঁথি লেখা হইত প্রাচীনতর আদর্শদৃষ্টে।... সাধারণ কাব্যসাহিত্যাদি লেখা হইত তুলোটের উপর, বিশেষ পূজাপদ্ধতিব পুঁথি লেখা হইত তালপত্রে। তাগা, তাবিজ, মাদুলি দেওয়া হইত ভূর্জ্জপত্রে লিখিয়া। তেরেট পাতা, তূঁত, নোনা, বট ইত্যাদি গাছের বাকল বা পশুচর্ম্মের উপর লেখা বাঙ্গালা পুঁথিও দুর্ল্লভ নয়। অলঙ্করণের দিকেও পুঁথির লিপিকর বা পাঠকদের দৃষ্টি কম ছিল না, হরিতাল, অভ্রাদি তুলোট কাগজে প্রলিপ্ত করা হইত পোকামাকড়ের কবল হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত।... লিপিতে ভূল থাকিলে তাহা ছত্রসংখ্যা দিয়া উপরে বা নীচে লিখিয়া দেওয়া হইত। পুঁথির মধ্যস্থলে ছিদ্র করিয়া উপরে সাধারণতঃ কাঠির পাটা দিয়া সজোরে বন্ধ করিতে হইত বায়ুপ্রবেশ বন্ধ করিয়া। পুঁথিকে দীর্ঘস্থায়ী করিবার ইহা একটি পন্থা। পুঁথির মলাট হিসাবে প্রায়ই দেখা যায় শাল, শেগুন কাঠের পাটা। চামড়ার খোলও করা হইত। তালপাতার বিনুনির উপর বেতির সূক্ষ্ম কাজ তাহাও আছে। তালের বিনানো বাগড়া, চামড়া ও কাঠ সবই মলাট ও তাহার স্থায়িত্বের জন্য ব্যবহৃত হইতেছে দেখা যায়। কাঠের পাটার উপর নানা নক্সা, চক্রাদি, চিত্রণাদি আধুনিক শিল্পাচার্যদিগেরও বিস্ময়ের বস্তু।
>
> পুঁথির পুষ্পিকাপদে লিপিকরের আত্মকাহিনী মহামূল্যবান উপকরণ সমাজতত্ত্ব বিষয়ে গবেষক প্রত্যেকের নিকট। পুঁথি নকল করিবার নিমিত্ত কে কত দক্ষিণা পাইলেন, কাপড়, গামছা কৌড়ি বা তঙ্কা কে কত পাইলেন, পুঁথির মালিক, পুঁথির মালিক কে, পাঠক কে, তাহার বিবরণ ও স্তুতিবাদ, কোথায় বসিয়া লিখিলেন, কখন পুঁথি নকল সমাপ্ত হইল তাহার সন, তারিখ, বার, বেলা, তিথি, নক্ষত্র, প্রহর, দণ্ড, পল, কোন্ মুখে বসিয়া লেখা, পরগণা, তৌজি, সাকিন, এগনে ওসারার সমস্ত বিবরণ আমরা পাই গ্রন্থের শেষ দিকে, লিপিকরের পুষ্পিকাপদ বা অংশ হইতে। আবার লিপিকরের আত্মকাহিনি, ধর্মমত, সাধ, আহ্লাদ, খ্যাতি, অপবাদ, গৃহবিবাদ, মুদ্রাদোষ,সবই পাওয়া যায়। হিন্দু বা মুসলমানদের ব্যবহারের নিমিত্ত পারসিক অক্ষরে গ্রন্থ হিন্দু আচারে হিন্দুরাও নকল করিয়া দিতেন। মুসলমানেরাও রামায়ণাদির গ্রন্থ নকল করিয়াছেন এই নজিরও দুর্ল্লভ নয়।"[১]

নামকরণ

বিষয়ভিত্তিক বিভিন্ন পুঁথিকে বিভিন্ন শিরোনামে চিহ্নিত করা হয়েছে। পুঁথির বিষয়, প্রকৃতি এবং রচয়িতার নাম অনুসারে বিভাজন করা হতো। ইসলাম ধর্ম বিষয়ক পুঁথিকে মুসলিম পুঁথি, হিন্দু ধর্ম বিষয়ক পুঁথিকে হিন্দু পুঁথি এবং সংস্কৃত ভাষায় লেখা পুঁথিকে সংস্কৃত পুঁথি বলা হতো। অনেক সময় রচয়িতার সম্প্রদায়গত পরিচয়ের ভিত্তিতেও এই বিভাজন করা হতো। পুঁথি বা পাণ্ডুলিপি উভয় শব্দই সমার্থক।

লিখন উপকরণ

পাণ্ডুলিপি লেখার কাজে প্রধানত কাগজ, কালি ও কলম এই তিনটি উপকরণ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ব্রাহ্মী লিপির পূর্ববর্তী কোনো লিপি আবিস্কৃত না হওয়ায় অধিকাংশ পণ্ডিত মনে করেন যে খ্রি.পূ. চতুর্থ শতকের আগে এদেশে লিখন পদ্ধতির প্রচলন ছিল না। বলা যায় ভারতীয় উপমহাদেশে ত্রয়োদশ শতাব্দীর আগে কাগজের ব্যবহারের কোনো নিদর্শন পাওয়া যায়নি।[২] লিপি বিদ্যার উদ্ভব কবে হয়েছিল তা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। গ্রীক বিজয়ের পর পরই লিখন

পদ্ধতি প্রচলিত হয়েছিল বলে অনেকের ধারণা। মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পায় সিন্ধুসভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হওয়ায় মনে করা হয় ভারতীয় উপমহাদেশে সিন্ধুসভ্যতার যুগে লিখন পদ্ধতির প্রচলন ছিল। সীলমোহর ছাড়া তাম্রফলক এবং পাত্রলিপিতেও সিন্ধুলিপির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। সিন্ধুলিপির বিভিন্ন নিদর্শনের মধ্যে একটি বিশিষ্ট ছোট পাত্র আবিষ্কৃত হয়েছে, যা পণ্ডিতদের মতে সম্ভবত কালির দোয়াতরূপে ব্যবহৃত হয়েছিল। প্রত্নতত্ত্ববিদ স্যার জন মার্শালের মতে,

> "মাটির ফলক বা সীলমোহরের বাইরে সিন্ধুলিপির ব্যবহারের বিশেষ নিদর্শন পাওয়া না গেলেও আমরা অনুমান করতে পারি যে, ভূর্জপত্র, তালপাতা , চামড়া, কাঠ বা কাপড়ে সিন্ধুলিপি লিখিত হয়েছিল। কিন্তু সে উপকরণগুলো অপেক্ষাকৃত কম টেকসই হওয়ায় তা কালের অতলে হারিয়ে গেছে।" [৩]

এই উপমহাদেশে অতি প্রাচীনকালেও যে লিখন পদ্ধতির প্রচলন ছিল তা পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণে লিপি, লিবি, লিবিকর ইত্যাদি শব্দের উল্লেখ থেকে প্রমাণিত হয়। পাণিনির সময়কাল খ্রি. পূ. চতুর্থ শতক, মতান্তরে খ্রি. পূ.৭ম-৬ষ্ঠ শতাব্দী। মহেঞ্জোদারো সভ্যতার প্রায় দু তিন হাজার বছর পর্যন্ত লিপির ব্যবহার বা লিখন পদ্ধতির প্রচলনের কোনো নিদর্শন বা উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায়নি। ভারতীয় উপমহাদেশের লিখনপদ্ধতি ইতিহাসে এই সুদীর্ঘ অন্ধকার যুগের সমাধান খুজঁতে গিয়ে কোনো কোনো পণ্ডিত সিন্ধুলিপি এবং ব্রাহ্মী বর্ণলিপির মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করেছেন। ভারতীয় উপমহাদেশে লেখার কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন উপকরণ নিম্নরূপ :

ভূর্জপত্র: ভূর্জগাছের বাকলে লেখার পদ্ধতি খুবই প্রাচীন। আলেকজান্ডারের বিজয়কালে তাঁর সেনাপতি কার্টিয়াস এদেশে ভূর্জপত্রে লেখার প্রচলন দেখেছিলেন। ভূর্জপত্রে লেখা প্রাচীনতম পাণ্ডুলিপি হলো খরোষ্ঠী ধম্মপদ (৪র্থ খ্রি.পূ.)। আফগানিস্থানে ভূর্জপত্রে লেখা অনেক বৌদ্ধশাস্ত্র আবিস্কৃত হয়েছে। পরবর্তীকালে কালিদাস (৫ম শতক), ক্ষেমেন্দ্র প্রমুখ লেখার কাজে ভূর্জগাছের ছাল ও পাতা ব্যবহারের উল্লেখ করেছেন।[৪] প্রাচীনকালে বাংলাদেশেও ভূর্জপত্রের ব্যবহার ছিল। বিশেষ করে তাগা তাবিজ ও মাদুলি দেয়া হতো ভূর্জপত্রে লিখে।[৫]

কাপড় বা কার্পাসিক পট: কাপড়ের পটে রাজকীয় বা ব্যক্তিগত দলিল লিখনের প্রচলন বেশ প্রাচীন। সাধারণ তেঁতুল বীজ থেকে প্রস্তুত এক প্রকার প্রলেপ কাপড়ে লাগিয়ে তার উপরে সাদা বা কালো অক্ষরে কিছু লেখা হতো। বাংলাদেশে পটচিত্রে কাপড়ের ব্যবহার এককালে বহুল প্রচলিত ছিল।

কাষ্ঠফলক: কাষ্ঠফলকে লেখার পদ্ধতি ভারতীয় উপমহাদেশে অতি বিরল। কাষ্ঠফলকে লেখা একটি প্রাচীন পাণ্ডুলিপির নিদর্শন অক্সফোর্ডে রক্ষিত আছে। পাণ্ডুলিপিটি আসাম থেকে সংগৃহীত।

তালপাতা: লেখার কাজে তালপাতা ব্যবহারের কথা চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং (সপ্তম শতাব্দী) তাঁর ভ্রমণ কাহিনিতে উল্লেখ করেছেন। ষষ্ঠ শতাব্দীতেও তালপত্রের ব্যবহার ছিল বলে জানা যায়। ভারতীয় উপমহাদেশের দক্ষিণ ভারত এবং উড়িষ্যায় ছুরি জাতীয় ধারালো কলমে আঁচড় কাটার পর তা মাঝখানে একটি ছিদ্র (কখনও বাঁ পাশে দুটো ছিদ্র) থাকতো- যার ভেতর দিয়ে পুঁথির পাতাগুলোকে একত্র রাখার জন্য দড়ি আটকানো হতো।

লিখনোপযোগী করার জন্য গাছ থেকে কেটে এনে তালপাতাকে গোছা করে বেঁধে পানিতে ডুবিয়ে রাখা হতো। এক মাস পর সেগুলোকে গোঁছা বাধা অবস্থাতেই পানি ঝরানোর জন্য ঝুলিয়ে রাখা হতো। এরপর পাতাগুলো আলাদা ছায়ায় শুকানো হতো। চার থেকে সাতদিন শুকানোর পর প্রতিটি পাতার দুদিকই শাঁখ দিয়ে ঘষে মসৃণ করার পর প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন আকৃতিতে কেটে নেয়া হতো।[৬] মজবুত করার জন্য তেঁতুলের বীজের ক্বাথ লাগানো হতো। একসময় তালপাতায় পূজা পদ্ধতির পুঁথি লেখা হতো। এছাড়াও তেরেট পাতা, শোলার শাঁস, তুঁত, নোনা, বট ইত্যাদি উপকরণেও বাংলা পুঁথি লেখা হতো। বিংশ শতকে পুঁথি লেখার কাজে তালপাতার বিশেষ ব্যবহার না থাকলেও এই শতকের গোড়ার দিকে পাঠশালায় তালপাতার ব্যাপক ব্যবহার ছিল। তালপাতার গুচ্ছ যা পাততাড়ি নামে পরিচিত তা নিয়ে ছেলে-মেয়েরা পাঠশালায় যেত। 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসে অপুকে তালপাতায় ক, খ লেখা শিখতে দেখা গিয়েছে। অনেকের মতে তালপাতার তাড়া বা গুচ্ছ থেকে পাততাড়ি শব্দের ব্যুৎপত্তি। কেউ কেউ মনে করেন, তালী শব্দ থেকেই 'তাড়ি' শব্দটি এসেছে।

তেরেট পাতা: তেরেট তাল জাতীয় বৃক্ষ। তেরেট পাতা তালপাতার চেয়ে লম্বা এবং টেকসই। তেরেট পাতার ব্যবহার কম। কবি মুকুন্দরামের পৈতৃক বাসভূমি দামুন্যায় তেরেট পাতায় লেখা চণ্ডীমঙ্গলের একটি পুঁথি সংরক্ষিত আছে। সুকুমার সেনের মতে পুঁথিটি ১৮২৫ খ্রি. এর নিকটবর্তী সময়ে লেখা।[৭]

পশুচর্ম: ভারতীয় উপমহাদেশে অন্যান্য পাণ্ডুলিপির তুলনায় চামড়ার পাণ্ডুলিপির ব্যবহার অপেক্ষাকৃত কম। চামড়ার প্রাচীন পাণ্ডুলিপিগুলোর অধিকাংশ খরোষ্ঠী লিপিতে লিখিত। খরোষ্ঠী শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ গাধার ওষ্ঠ (ঠোঁট)।

ধাতব পাত: এই উপমহাদেশে প্রাচীনকালে দানপত্র, রাজকীয় বিজ্ঞপ্তি এবং বৈষয়িক দলিল সম্পাদনের কাজে ধাতব পাতের ব্যবহার ছিল। তক্ষশিলার বৌদ্ধস্তুপে খরোষ্ঠী লিপিতে লিখিত স্বর্ণ ও রৌপ্য পত্রের নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। ফা হিয়েনের (আনুমানিক ৪০০ খ্রি.) বিবরণীতে বুদ্ধের সমকালীন একটি তাম্রপত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। ভারতীয় উপমহাদেশে বিভিন্ন আকারের তাম্রপত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। বাংলাদেশে গুপ্ত, পাল ও

সেন রাজাদের আমলের বিভিন্ন তাম্রপত্র পাওয়া গিয়েছে। এই তাম্রপত্রগুলোতে যেমন একদিকে সে যুগের ইতিহাস বিধৃত, তেমন তাতে প্রাচীন বাংলা লিপির নিদর্শনও বিদ্যমান।

শিলা: ভারতীয় উপমহাদেশে প্রাচীনকাল থেকেই বিভিন্ন আকারের পাথর নানা জাতীয় লেখার কাজে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। শিলা লিপিতে রাজকীয় বিজ্ঞপ্তি থেকে শুরু করে সাহিত্যকর্মও উৎকীর্ণ হতো। 'ললিতবিগ্রহরাজ' নাটকটি শিলালিপিতে উৎকীর্ণ হয়েছিল বলে জানা যায়। শিলালিপিতে উৎকীর্ণ জৈন স্থলপুরাণের নিদর্শনও আবিষ্কৃত হয়েছে।

ইট: উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ইটের গায়ে উৎকীর্ণ কতগুলো বৌদ্ধ সূত্রের নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। সে সব সূত্র ইট পোড়ানোর আগেই নরম মাটিতে উৎকীর্ণ হয়েছিল।

কাগজ: লেখার কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন উপকরণের মধ্যে কাগজ অপেক্ষাকৃত অর্বাচীনকালের। কাগজ শব্দটির মূল ফারসি। খ্রি. ১১ শতকে সুলতান মাহমুদ গজনী এই উপমহাদেশে সর্বপ্রথম পাঞ্জাব ও কাশ্মীরে কাগজের ব্যবহার প্রচলন করেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীর আগে তৈরি কাগজের কোনো নিদর্শন এ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

বাংলাদেশে কাগজ তৈরির প্রথা প্রথম মুসলমানেরা প্রবর্তন করেন। পাঠান আমলের বাংলাদেশ সম্বন্ধে চীনা ভাষায় রক্ষিত এক দলিলে তুঁত গাছের ছালে তৈরি কাগজের উল্লেখ পাওয়া যায়।[৮] আমাদের দেশে তুলট কাগজের ব্যবহার বহু প্রাচীন। তুলা থেকে তৈরি কাগজকেই শুধু তুলট কাগজ বলা হয় না। যে কোনো মণ্ড দিয়ে প্রস্তুত হাতে তৈরী কাগজই তুলট কাগজ নামে পরিচিত। তুলট কাগজের মণ্ড পাট, শন, তুঁত গাছের ছাল, ন্যাকড়া, ঘাস, খড় ইত্যাদি থেকে তৈরি হতো। সে মণ্ড থেকে প্রস্তুত কাগজ প্রথমে রোদে শুকানো হয় এবং পরে তা লাউ বা তেঁতুলের বীজ ও হরিতাল মেখে হরিদ্রা রং করা হতো, তাতে কাগজে পোকা ধরতো না। এরূপ কাগজ সাধরণত 'হরিতালী কাগজ' নামে পরিচিত। ভারতীয় উপমহাদেশে শ্রীরামপুর, বর্ধমান ও ঢাকার কাগজ ছিল উৎকৃষ্ট। কাগজ শিল্পে নিয়োজিত লোকেরা 'কাগজী'[৯] নামে পরিচিত ছিল। ষোড়শ শতাব্দীর কবি মুকুন্দরামের কাব্যে 'কাগজী' নামে কাগজ প্রস্তুতকারী সম্প্রদায়ের উল্লেখ পাওয়া যায়।

লেখনী বা কলম

এই উপমহাদেশে কঞ্চি, শর, খাগড়া, ময়ূর বা শকুনের পালক, লোহা ইত্যাদি উপকরণে তৈরি লেখনীর উল্লেখ পাওয়া যায়। কঞ্চি, শর, খাগড়া, পালকের কলমের অগ্রভাগ লেখার সুবিধার্থে সামান্য একটু কেটে নেয়া হতো। সপ্তদশ শতাব্দীর কবি আব্দুল হাকিম একে কলমের দুটো মুখ বলে উল্লেখ করেছেন,

কলমের দুই মুখ বিনে কদাচন।
লিখন না যায় ব্যক্ত গুপ্ত বিবরণ ॥ (নূরনামা)

সে-সময়ে লেখার কাজে হাতে তৈরি নরম কাগজ ব্যবহৃত হতো। সেকারণে লেখার সুবিধার্থে ধাতব লেখনীর বদলে কঞ্চি, শর বা পাখির পালকের কলমই বেশি সুবিধাজনক মনে করা হতো।

পাণ্ডুলিপিতে ব্যবহৃত কালি

এদেশে বহুকাল পূর্ব থেকে কালির ব্যবহার প্রচলিত। মহেঞ্জোদারোতে প্রাপ্ত দোয়াত আকৃতির পাত্র প্রমাণ করে যে সে যুগে কালির ব্যবহার প্রচলিত ছিল। সাধারণত কালো বর্ণের কালিই পাণ্ডুলিপিতে ব্যবহৃত হতো। লাল এবং পাণ্ডুবর্ণের কালির ব্যবহারও প্রচলিত ছিল। লাল এবং কালো দুই কালির সংমিশ্রণে লেখার ব্যবহারও প্রচলিত ছিল। কালো কালি দিয়ে পংক্তি লিখে লাল কালিতে দেয়া হতো বিরাম চিহ্ন। বৈষ্ণবকাব্য এবং তন্ত্রশ্রেণির পাণ্ডুলিপিতে দুই কালির মিশ্রণ দেখা যায়। জৈন পাণ্ডুলিপিতে প্রথমে রঙিন কালির বিশেষ করে লাল হিঙ্গুলার রঙের ব্যবহার দেখা যায়। বাংলা পুঁথিতে অঙ্কিত চিত্রে এবং কখনো কখনো পুঁথির সীমারেখায় লাল কালির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। দেশীয় বিভিন্ন উপাদান দিয়ে নানা প্রকার কালি তৈরি হতো। সে সময়ে ঘরে ঘরে কুটির শিল্পের মতো কালি তৈরি হতো। উপকরণ ছিল ত্রিফলা, শিমূল গাছের ছাল, ছাগলের দুধ, লোহার গুঁড়ো, লাক্ষা বা লাহা, জবার কুঁড়ি, গাবের ফল, হরীতকী, ভৃঙ্গার্জুন গাছের ছাল, আমলকী, বাবলা গাছের ছাল, ডালিমের রস, কাঠকয়লা প্রভৃতি। প্রাচীন বাংলা পুঁথিতে কালি প্রস্তুতের অনেক ছড়া পাওয়া যায়। এ জাতীয় ছড়া যেমন,

ক. তিন ত্রিফলা শিমূল ছালা।
ছাগদুগ্ধে দিয়ে তেলা।
মসী বলে অকাট বসি।
খ. লোধ লাহা লোহার গুঁড়ি
অর্কাঙ্গার জবার কড়ি।
গাবের ফল হরিতকী।

ভৃঙ্গার্জুন আমলকী।
বাবলা ছাল জাঁটির রস
ডালিম ছেঁচে করিবে কষ ॥
ভেলায় করৎ এক আলি
চারি যুগালা উঠাবে কালি। [১০]

কষকালি

বিভিন্ন মশলার কষ দিয়ে তৈরি হতো বলে এই কালির নাম কষকালি। আরেক ধরনের কালি ছিল খোলা হাঁড়িতে ভাজা পোড়াচাল দিয়ে তৈরি ভূষাকালি। কালির রং ঘন কালো বলে পানি লাগলেও এই কালি সহজে উঠতো না। তাই ছড়ায় বলা হতো- 'ছিড়ে পত্র না ছাড়ে মসি'।[১১] লিপিকরেরা নিজেরাই কালি তৈরি করতেন। একজন লিপিকর লিখেছিলেন,

"হীন সদর আলী লেখে, দিআ নিজ কালি" (ঢা.বি. পুথি ৩৬৫/৬৮৬)
"কালি কলম মন,
লেখে তিন জন"- প্রচলিত এই বাংলা প্রবাদের অর্থ লেখার কাজে কালি ও কলম এই দুটি উপরণ ছাড়াও এর পেছনে থাকে মানুষের সক্রিয় মন। এই মনের ইচ্ছাতেই লিখন পদ্ধতির উদ্ভব ও প্রচলন।

বালির পুঁটুলী

সে কালে চোষ কাগজ বা ব্লটিং পেপারের ব্যবহার ছিল না। কিন্তু তার বদলে বালির পুটুলীর ব্যবহার ছিল। লেখার সময় অতিরিক্ত কালি পড়ে গেলে তা শুষে নেয়ার জন্য কাপড়ের পুটুলীতে বালির ব্যবহার ছিল।

পাণ্ডুলিপির আকৃতি

কাগজ বা উপকরণ ভেদে প্রাচীন পাণ্ডুলিপি বিভিন্ন আকারের হতো। প্রস্থে তালপাতা একই রকম হয়ে থাকে বলে তালপাতার পুঁথির চওড়া প্রায় একই হয়ে থাকে। তবে এই পুথি লম্বায় প্রয়োজন অনুসারে ছোট বড় হয়। শুকনো ও পুরনো তালপাতা ভঙ্গুর বলে পুঁথির পাতা যথাসম্ভব ছোট রাখা হয়। তেরেট পাতা চওড়ায় তাল পাতার চেয়ে বড় বলে তেরেট পাতার পুঁথি চওড়ায় বড় হয়। রুচি, উপকরণের প্রাপ্তি ইত্যাদি ভেদে পাণ্ডুলিপির আকারে প্রকারে বিভিন্নতা থাকে।

আকৃতির দিক থেকে পাণ্ডুলিপি সমূহকে মোটামুটি বৃহৎ, মধ্যম ও ক্ষুদ্র এই তিন শ্রেণিতে বিন্যস্ত করা যায়। বৃহৎ আয়তনের পাণ্ডুলিপির পরিমাপ সাধারণত ৭৮.৫×৪ সে.মি. থেকে ৫২×১৩.৫ সে.মি. হতো। মধ্যম আকারের পাণ্ডুলিপির পরিমাণ ৪৮.৫×১৯ সে.মি. থেকে ২০×১৩.৫ সে.মি. এবং ক্ষুদ্র আকারের পাণ্ডুলিপির পরিমাণ ১৭.৫×৬.৫ সে.মি. থেকে ৫.৫×২.৫ সে.মি. হয়ে থাকে। সাধারণত তালপাতা, কলাপাতা, তেরেটপত্র ও ভূর্জপত্রে লেখা পাণ্ডুলিপিগুলো ক্ষুদ্র আকৃতির হয়ে থাকে। তেরেটপাতা তালপাতার চেয়ে প্রশস্ত বলে এই পাতার পাণ্ডুলিপির আকার প্রশস্ত হয়। সুপারি গাছের খোলে লেখা পাণ্ডুলিপি প্রাকৃতিক কারণেই সুদৃঢ় এবং দীর্ঘস্থায়ী। তুলট কাগজে লেখা পাণ্ডুলিপি সাধারণত বৃহৎ ও প্রশস্ত আকারের হয়ে থাকে। বিভিন্ন পাতায় লেখা পাণ্ডুলিপি থেকে গাছের বাকলে লেখা পাণ্ডুলিপি বড় এবং প্রশস্ত হতো। বিষয়ভেদেও পাণ্ডুলিপির আকারে তারতম্য হতো। যেমন *রামায়ণ, মহাভারত*, *পুরাণ* ইত্যাদি বিষয় সম্বলিত পাণ্ডুলিপি বৃহদায়তনের হতো। পক্ষান্তরে মন্ত্র, স্তোত্র, কবচ ইত্যাদি বিষয় অবলম্বনে রচিত পাণ্ডুলিপি ক্ষুদ্র আয়তনের হতো। তুলট কাগজে লেখা পাণ্ডুলিপির সংখ্যা বেশি, দ্বিতীয় স্থানে তালপাতায় লেখা পাণ্ডুলিপি। খ্রি. ১৭ শতকের পরবর্তী পাণ্ডুলিপিগুলো সাধারণত বৃহৎ আকারের হতো। বিষয় এবং অক্ষর অনুসারে পাণ্ডুলিপির আকারের তারতম্য ঘটেছে। সতের শতকে পাওয়া লেখা দলিল সাধারণত তুলট কাগজে লেখা হতো বলে আকারে ক্ষুদ্র হতো। সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময়ের একটি দলিলের আকার ১৬×১৫ সে.মি. তুলট কাগজে লেখা দলিল ক্রমে বৃহদাকৃতির হতে থাকে এবং আকার ২০×৪০ সেন্টিমিটার হয়। উনিশ শতকে ব্রিটিশ আমলে লেখা দলিলপত্র তুলট কাগজের পরিবর্তে মিলকাগজে রূপ নেয়। প্রাচীন পাণ্ডুলিপির পাতাগুলো থাকতো পাততাড়ির মতো এবং একের পর এক সাজানো আলগা এবং সেলাইবিহীন। বই এর আকারে সেলাই করা পুঁথির প্রচলন আঠারো শতকের প্রথমার্ধে শুরু হয়। সেলাই ছাড়া পুঁথির পাতাগুলো যাতে এলোমেলো বা বিচ্ছিন্ন না হয় সেজন্য কাঠের পাটা দিয়ে পাণ্ডুলিপিকে শক্ত করে বেঁধে রাখা হতো। পুঁথিকে অযত্নে রাখলে বা ঢিলা করে বাঁধলে তার আয়ু কমে যায়।

পুঁথিতে ব্যবহৃত পাটা প্রায় ক্ষেত্রেই শাল বা সেগুন কাঠের তৈরি, চামড়ার খোলও সে কাজে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। কাঠের পাটার ওপর নানা রকমের নক্শা, চক্র বা চিত্র খোদাই করা হতো। এই পাটার বাইরের দিকে পাণ্ডুলিপির বিষয়বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কিত নানা চিত্র অঙ্কিত থাকতো। *রামায়ণ*, *মহাভারত* বা কৃষ্ণলীলা বিষয়ক পুঁথির কয়েকটি পাতায় রঙিন চিত্র লক্ষ করা যায়। লাক্ষা রঙের বা সিঁদুরের রঙের পটভূমিতে সোনালী, হলুদ, সবুজ বা বাদামী রঙ দিয়ে চিত্র আঁকা হয়েছে। প্রতিটি চিত্রে বস্তুর সীমারেখা কালো রঙে আঁকা। বিশেষজ্ঞদের মতে সতের শতকের লোকশিল্পের প্রভাব এসব চিত্রে সুস্পষ্ট।[১২] পাটার ভেতরের দিকে থাকতো লতাপাতার চিত্র।

পুঁথির পৃষ্ঠাতেও বিষয়বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কিত চিত্র অঙ্কিত থাকতো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত একটি পুঁথির পাতায় পাণ্ডুলিপি চিত্রের অনেক নিদর্শন রয়েছে। ১৮০৫ খ্রি. লিপিকর এবং চিত্রকর নয়ানকৃষ্ণ ঘোষ এই পুঁথি অনুলিখন করেন। পুঁথির পাতায় হলদে রঙের পটভূমিতে প্রধানত কালো এবং লাল রঙ ব্যবহৃত হয়েছে। প্রাচীন বাংলার পটশিল্পের বিশেষ প্রভাব এতে বর্তমান। গ্রাম্য পটুয়ারা আকর্ণ বিস্তৃত বিষ্ফারিত নারীচক্ষু পটে আঁকতেন।[১৩] পুঁথির পাটাতনে এরকমই চিত্র অঙ্কিত হতো। নানা রঙের ব্যবহারও হতো এসব পুঁথিতে। ইসলামী পুঁথিতে সাধারণত কোনো চিত্র থাকে না। তবে কোনো কোনো লিপিকর পৃষ্ঠার চারপাশে লতা পাতা বা ফুলের চিত্র আঁকত। কোনো কোনো পুঁথির পাতায় খোদাই করা নকশাও থাকতো।

লিখনসৌকর্য

প্রাচীন পাণ্ডুলিপিতে যে লিপি লেখা হতো তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিল সুন্দর ও সুশৃঙ্খল। অক্ষরের আয়তন এবং মাত্রা সর্বত্রই ছিল সমান। ধারালো ছুরি দিয়ে কঠিন পাথরে বা ধাতব পাতে খোদাই করার সময় মাত্রার সমতা বজায় রাখা সম্ভব হতো না। প্রাচীন পাণ্ডুলিপিতে 'একের নিচে আর' এভাবে না লিখে একাদিক্রমে লেখার রেওয়াজ ছিল। প্রতিটি চরণে নিরবচ্ছিন্ন একটানা লেখা থাকতো। বিভিন্ন শব্দের মাঝখানে কোনো ফাঁকা থাকতো না।

নমুনা : এক স্তিরি লৈয়া ঘর করে যেই জন। সে বিবির আজ্ঞা বিনে নাপারে করিতে ।
জঞ্জাল না হএ তার আনন্দিত মন। এমত করিল যদি প্রভু নিরাঞ্জন।
কদাচিত্য চাহে জদি দ্বিতীয়া করিতে। সুনিয়া আদম নবি য়ানন্দিত মন।

একটানা লেখার এই রীতিকে 'একটানা লিপি' (Scriptura Continua) বলা হয়। এই পদ্ধতিতে পাঠক দ্রুত নির্ভুলভাবে পড়ে যেতো। কখনও কখনও একটানা লিপির পরিবর্তে বিভিন্ন শব্দের মধ্যে ফাঁক লক্ষ্য করা যায়। বিরাম চিহ্নের মধ্যে একমাত্র দাঁড়ি চিহ্নেরই ব্যবহার দেখা যায়। বুহ্‌লার সাহেব লিপিতে আট রকম বিরাম চিহ্নের কথা উল্লেখ করেছেন- এগুলো হচ্ছে এক দাঁড়ি, দুই দাঁড়ি, তিন দাঁড়ি ও অর্ধচন্দ্র। লিপিকরেরা প্রায়ই প্রতি পদে প্রথম চরণ ও দ্বিতীয় চরণ পৃথক রূপে ব্যবহার করতেন। সেকালের পুঁথির পাতায় উভয় পৃষ্ঠায় লেখা হতো। পুঁথির কাগজ পাতলা হলে কাগজ দুভাঁজ করে নিয়ে দুই পাশে লেখার রীতি ছিল।

পত্রাঙ্ক নির্দেশ

পত্রাঙ্ক নির্দেশের ক্ষেত্রে পৃষ্ঠার পরিবর্তে পাতাকে একক ধরে প্রতি পাতায় পত্রাঙ্ক দেয়া হয়েছে। পত্রাঙ্ক প্রতি পৃষ্ঠায় না লিখে সাধারণত পাতার দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় লেখা হতো। পাণ্ডুলিপির একটি পাতায় এক পিঠে যদি পত্রাঙ্ক থাকে সাতচলিশ্ল তাহলে ধরে নিতে হবে ঐ পৃষ্ঠাটি সাতচল্লিশ সংখ্যক পাতার দ্বিতীয় পৃষ্ঠা। এস.এম.কাত্‌রে তাঁর Introduction to Indian Textual Criticism গ্রন্থে পত্রাঙ্ক নির্দেশের দুটো রীতিতে দুটো অঞ্চলভেদে পার্থক্য লক্ষ্য করেছেন। উত্তরাঞ্চলের পাণ্ডুলিপিতে পত্রাঙ্ক পাতার দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় থাকে আর দক্ষিণাঞ্চলের পাণ্ডুলিপিতে পত্রাঙ্ক থাকে পাতার প্রথম পৃষ্ঠায়।

বাংলা পুঁথিতে উত্তরাঞ্চলের রীতিই অনুসৃত হয়েছে। কিন্তু 'সতীময়নালোর চন্দ্রাণীর' একটি পুথিতে (বা-এ ২০ দৌ., আ) পাতার দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পরিবর্তে প্রথম পৃষ্ঠায় পত্রাঙ্ক দেওয়া হয়েছে। পত্রসংখ্যা পাতার উপরে বা পাশে থাকে। কোনো কোনো পাণ্ডুলিপিতে পত্রাঙ্ক পাতার মাঝখানে পাঠের মধ্যবর্তী ফাঁকা জায়গায় লিখিত হতো। পত্রাঙ্ক পাতার নিচে লেখা হতো না। সাধারণত সংখ্যায় পত্রাঙ্ক নির্দেশ করা হতো- যেমন ৩৭। আবার কখনও টাকা, আনা, চিহ্ন দিয়েও পত্রাঙ্ক নির্দেশ করা হতো। যেমন দুটাকা চার আনা (অর্থাৎ ৩৬) বাঁ দিকের মার্জিনে টাকা আনার চিহ্নে পত্রাঙ্ক নির্দেশ পত্রাঙ্ক লেখার একটি বিশিষ্ট রীতি।[১৪] বাংলা একাডেমির একটি পুঁথিতে (ইউসুফ জলিখা, নং ২২১) পৃষ্ঠার ডান পাশে টাকা আনা চিহ্নে পত্রাঙ্ক দেয়া হয়েছে। এই পুথিতে প্রতি পাতার শেষ পৃষ্ঠায় তিন জায়গায় পত্রসংখ্যা লেখা হয়েছে, যেমন বাঁ পাশে ও মাঝখানে ৬৬, ডান পাশে টাকা আনা চিহ্নে ৪√। বহু পর্ববিশিষ্ট বৃহদাকার পাণ্ডুলিপিতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে দুটো পত্রসংখ্যা দেওয়া আছে।

বাংলা একাডেমিতে সংরক্ষিত সঞ্জয়ের *মহাভারতের* একটি পুঁথিতে এরূপ দুটি পত্রসংখ্যা দেওয়া আছে। কোনো কোনো লিপিকর পাণ্ডুলিপিতে পত্রাঙ্ক নির্দেশ করত না। পত্রাঙ্ক বিহীন পাণ্ডুলিপিতে লিপিকর সাধারণত প্রতি পাতার শেষে পরবর্তী পাতার প্রথম পৃষ্ঠার প্রথম চরণের অংশবিশেষ লিখে রাখতো। এর ফলে পত্রসংখ্যা না থাকলেও পুথির ধারাবাহিকতা বজায় থাকতো। ধারাবাহিকতা বজায় না রাখলে পরবর্তীতে কোনো কারণে পাণ্ডুলিপির পাতাগুলো এলোমেলো হয়ে গেলে সেগুলোকে ঠিকমত একত্রে সাজানো সমস্যার সৃষ্টি করত। পুঁথির সৌন্দর্যবৃদ্ধির জন্য লেখার চারপাশে সীমারেখায় লাল কালি ব্যবহৃত হতো। হ্যালহেড সংগৃহীত 'চণ্ডীমঙ্গলে'র একটি পুঁথিতে কালো ও লাল উভয় রঙের কালি ব্যবহৃত হয়েছে। ফারসি পাণ্ডুলিপিতে বিভিন্ন রঙে অলংকরণ একটি সুপ্রাচীন শিল্পকর্ম।

পুঁথি পরিচায়ন

একালের পুস্তকের মতো সেকালের পুঁথিতে কোনো নাম পৃষ্ঠার ব্যবহার ছিল না। কোনো কোনো পুঁথির শুরুতে গ্রন্থনাম নির্দেশক উক্তি পাওয়া যায় :

ক. এই পুস্তক সতী মএনার বার মাস (ঢা.বি.৪৮৫/৪৯৬)।
খ. অথ গৌরিমঙ্গল লিক্ষিতে (বিশ্বভারতী ১৫১৬)

কোথাও গ্রন্থের নাম পুঁথির শেষে প্রদত্ত হয়েছে,

যেমন ইতি সপ্তজ্ঞান প্রদীপ লেখিতং (ঢা.বি.ক্রমিক ৩৯০/৯৮১)
শাহাদৌলা পীরের পুঁথি সমাপ্ত হইলেন (ঢা.বি.৪৫৬/২০৫)

পাণ্ডুলিপির শেষে অনেক লিপিকরই সমাপ্তিসূচক উক্তি লিখে দিতেন, যেমন-'পুস্তক সমাপ্ত', তামাম সোদ, সাঙ্গ তামাম, বিশেষ ইতি। অধিকাংশ পুঁথির শুরুতে স্রষ্টা বা দেবদেবীর নাম অথবা মাঙ্গলিক চিহ্ন আঞ্জি (৭) এর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় :

ক. ৭ শ্রীশ্রী হক নাম (ঢা.বি. ৪৫৪/৪৬০)
খ. ৭ আল্লাহো করিম রহিম (ঢা.বি. ৪৩৩/৪৫১)
গ. ৭ শ্রীশ্রী হরি (বিশ্ব ভারতী পুথি ১৫০৮)

অধ্যায় বিন্যাস

প্রাচীন পুঁথিতে সূচিপত্র বিন্যাসের প্রথাও প্রচলিত ছিল, 'পদ্মাবতী'র একটি পাণ্ডুলিপিতে কাব্যে বর্ণিত বিষয়ের পূর্ণ সূচি পাওয়া যায়। বিশ্বভারতীতে সংরক্ষিত 'ধর্মপুরাণে'র একটি পুঁথির প্রথম ছয়টি পত্রে গ্রন্থের বিস্তারিত সূচি প্রদত্ত হয়েছে (বিশ্ব ভারতী পুঁথি ১৫৩০)। ফারসি পাণ্ডুলিপিতে বাব (অধ্যায়) বা সূচিপ্রদান একটি প্রচলিত রীতি। ধর্মোপাখ্যান বিষয়ক গ্রন্থ ছাড়াও প্রণয়োপাখ্যান জাতীয় কাব্যও আরবি হরফে লেখা হয়েছে। একটি বারমাসী পুঁথির শেষে লিপিকর লিখেছেন :

বারমাস লেখা হৈল আর লিখিব কি
পূর্বে ছিল বাঙ্গালা করিলাম আরবি।(ঢা.বি. ৩২৫-৩১/৬৯৯-৭০৫)

ওড়িয়া অক্ষরে লেখা বহু বাংলা পুঁথি উড়িষ্যা রাজ প্রদর্শনমালা (ভুবনেশ্বর) এ রাখা আছে।

পুঁথি নকল

পারিশ্রমিকের বিনিময়ে পুথি নকল করানো হতো। পুঁথি বিক্রয়ের রীতিও ছিল। কোনো কোনো পুঁথির শেষে তার মূল্য লেখা থাকতো,

'চারি মোকামের কথা সমাপ্ত। মূল্য দুই আনা।' (ঢা.বি. ৫৬৮-৬০/১০৮)
বিশ্বভারতী পুঁথিশালার একটি পুথি (কবিচন্দ্র রচিত কপিলামঙ্গলা) শেষেও মূল্য লেখা আছে দুই আনা।

অব্দগণনা

প্রাচীন পাণ্ডুলিপিতে অধুনা অপ্রচলিত অনেক অব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। আমাদের দেশে প্রচলিত কয়েকটি অব্দের বর্ণনা দেওয়া হলো। যেমন,

খ্রিষ্টাব্দ: খ্রিষ্টাব্দ সৌর বর্ষ। যীশু খ্রিষ্টের জন্মের তিন বছর পর থেকে খ্রিষ্টাব্দ গণনা করা হয়।

হিজরী অব্দ: বাংলাদেশে মুসলিম বিজয়ের পর হিজরী সনের প্রচলন শুরু হয়।

মল্লাব্দ: বিষ্ণুপুরে রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা আদিমল্ল ৬৯৬ খ্রি. এ মল্লাব্দের প্রবর্তন করেন। মল্লাব্দের সঙ্গে ৬৯৬ যোগ করলে খ্রি. পাওয়া যায়। ফকিররাম কবিভূষণ রচনাকাল মল্লাব্দে লিখেছেন: 'ইন্দু বিন্দু সিন্ধু প্রবর্ত মল্ল সন'।[১৫]

শকাব্দ: শকরাজা শালিবাহনের মৃত্যুর পর থেকে শকাব্দের সূচনা হয়েছে।[১৬] খ্রিষ্টাব্দ সূচনার ৭৮ বৎসর পর থেকে শকাব্দের গণনা শুরু হয়। যথা সিন্ধু ইন্দু বেদ শশী শক পরিমাণ (বিপ্রদাস)= ১৪১৭ শকাব্দ।

বঙ্গাব্দ: সম্রাট আকবর এই সৌর সনের প্রচলন করেন। খ্রিস্টীয় সাল অনুসারে সম্রাট আকবর ১৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। বঙ্গাব্দের সঙ্গে ৫৯৩ যোগ করলে খ্রিষ্টাব্দ পাওয়া যায়।

সম্বৎ: সম্বৎ শব্দের আভিধানিক অর্থ বৎসর। রাজা বিক্রমাদিত্য কর্তৃক প্রচলিত সনই সম্বৎ। সম্বৎ অব্দ থেকে ৫৭ বিয়োগ করলে খ্রিষ্টাব্দ পাওয়া যায়।

মঘী অব্দ: আরাকনে ৬৩৮ খ্রিষ্টাব্দে চন্দ্রবংশীয় রাজা মঘী সনের প্রচলন করেন।

লক্ষ্মণাব্দ: বল্লাল সেনের পুত্র লক্ষ্মণ সেন ১১১৮ খ্রি. এ রাজ্যাভিষেকের পর থেকে এই অব্দের প্রচলন হয়। লক্ষ্মণাব্দের সঙ্গে ১১১৮ যোগ করলে খ্রিষ্টাব্দ হয়।

ত্রিপুরাব্দ: ত্রিপুরা অঞ্চলে প্রচলিত এই অব্দ শুরু হয় ৫৯০ খ্রিষ্টাব্দ। ত্রিপুরাব্দের সঙ্গে ৫৯০ যোগ করলে খ্রিষ্টাব্দ হয়।

চৈতন্যাব্দ: বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত এই অব্দ চৈতন্যের জন্মকাল অর্থাৎ ১৪৫৮ খ্রি. থেকে গণনা করা হয়।

নেপাল সংবৎ: নেপালে প্রাপ্ত বিভিন্ন পুঁথিতে নেপাল সংবৎ ৭৪৯ অর্থাৎ ১৬২৯ খ্রি. এ প্রচলিত হয়।

দানিশাব্দ: বরেন্দ্র মিউজিয়ামে সংরক্ষিত 'আইনসার সংগ্রহ' (শম্ভুচন্দ্র রচিত) পুঁথির লিপিকাল 'বঙ্গাব্দ ১২৪৮ দানিশাব্দ ৯১'।

কবি শকাঙ্ক: পাণ্ডুলিপির রচনাকাল নির্দেশের দুটি প্রক্রিয়া ছিল :

১. সংখ্যার রচনাকাল নির্দেশ
২. হেঁয়ালি জাতীয় শ্লোকের মাধ্যমে রচনাকাল প্রকাশ।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে সাংকেতিক ভাষায় লিখিত এই সময়কাল 'কবিশকাঙ্ক' নামে পরিচিত। রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বাঙ্গালার ইতিহাস (২য় খণ্ড) গ্রন্থে বিদ্যাপতি রচিত অবহট্ট ভাষার একটি পদের উল্লেখ করেছেন,

অনল রন্ধকর লক্কণ পরিবর্ত
সক সমুদ্দকর অগিনি সসী

অনল, রন্ধ এবং কর এই তিনটি বিশেষ্য শব্দের গাণিতিক অর্থ যথাক্রমে ৩, ৯ এবং ২। সংস্কৃত গ্রন্থে সাল গণনার একটি বিশেষ রীতি ছিল- 'অঙ্কানাং বামতো গতিঃ' অর্থাৎ সংখ্যাশব্দ দক্ষিণ থেকে বামে পড়তে হয়। সে রীতি অনুসারে উপরের 'অনল রন্ধকর' কথাটির অর্থ দাঁড়ায় ২৯৩ লক্ষ্মণাব্দ। দ্বিতীয় চরণে 'সমুদ্র' 'কর' 'অগ্নি' ও শশীর অর্থ বামাগতিতে ১৩২৪ শকাব্দ। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন পর্বে রচনাকাল নির্দেশের রীতি ছিল না। চর্যাপদ, কৃষ্ণকীর্তন বা সগীরের ইউসুফ জোলেখায় রচনাকাল নেই। কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণীতে কবি নিজের জন্মতারিখ নির্দেশ করেছেন :

আদিত্যবার শ্রী পঞ্চমী পূর্ণ মাঘ মাস।
তথিমধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস ॥

পঞ্চদশ শতাব্দীর কবি বিজয়গুপ্ত তাঁর পদ্মপুরাণ গ্রন্থ রচনাকাল জ্ঞাপক নিম্নলিখিত শ্লোকে বলেছেন :

''ঋতু শশী বেদ শশী পরিমিত শক''-অর্থাৎ ঋতু ৬ শশী-১, বেদ-৪, শশী-১ ; ১৪১৬ শক।

লিপিকর

পুঁথি বা পাণ্ডুলিপি যারা নকল করে তারা 'লিপিকর' (Scribe) নামে পরিচিত। প্রাচীন ভারতে চতুর্থ শতক থেকেই পেশাদার লিপিকর ছিলেন। পাণ্ডুলিপিতে লিপিকরেরা নিজেদের নামের সঙ্গে লিপিকর শব্দটি ব্যবহার করতেন না। তাঁরা লিখতেন,

ব-কলম (ব-কলম শ্রী চান্দ ঢা.বি.আ.করিম পুথি৯৫/১৯৪)
স-অক্ষর (সোয়ক্ষর শ্রী কালিদাস ঢা.বি.পুথি ৪৬১/৪৬৯)

পুথি লেখার কাজকে সেকালে কাগজ করাও বলা হতো ('বাঙ্গালাতে জানি আমি কাগজ করিতে' বিশ্বভারতী পুঁথি ২২০)। কোনো কোনো লিপিকর নিজেরাই কালি তৈরি করতেন। মুদ্রাযন্ত্র প্রবর্তনের আগে থেকেই পুঁথি নকল করা এদেশে পেশা ছিল। নিজে পড়ার জন্যও অনেকে পুঁথি নকল করতেন। ত্রিপুরার বগাশাইর থানা নিবাসী জমিলা ও জপেলা গাজী নামে দু'জন মহিলা নিজেদের ব্যবহারের জন্য কবি আব্দুল হাকিমের 'লালমতী সয়ফুল মূলক' কাব্যটি নকল করেন (বাংলা একাডেমি উন্নয়ন বোর্ড পুঁথি-১৫৮)। মধ্যযুগের মুসলিম মহিলা কবি রহিমুন্নেসা দৌলত উজীর বাহরাম খানের 'লায়লী মজনু' কাব্যের একটি পুঁথির লিপিকর। ভোলা গাজী নামে জনৈক দরজিও তার নিজের জন্য তোহ্‌ফা পুঁথি নকল করেন। লিপিকরদের মধ্যে অধিকাংশ ছিলেন স্বল্পশিক্ষিত বা স্বাক্ষর মাত্র। ভাষা ও বানান সম্পর্কে সীমিত জ্ঞানের কারণে পাণ্ডুলিপিতে অজস্র বানান ভুল লক্ষ্য করা যায়। যেমন,

লাল মুওজুন (লায়লী মজনু, ঢা.বি.৪৪১/৪৬৩),
জোক কালয়ন্ত (যোগ কালন্দও, ঢা.বি.৫৬৮/১০৮)।

পুষ্পিকা

সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি বা খণ্ডবিশেষের শেষে লিপিকর অনেক সময় সমাপ্তি নির্দেশক বা আত্মপরিচিতি সংযোজন করতেন। এই অতিরিক্ত অংশ পুঁথির পুষ্পিকা বা Colophon নামে পরিচিত। পুষ্পিকায় লিপিকর মাঝে মাঝে নিজের নাম, ঠিকানা, লিপিকাল ছাড়াও মালিকের পরিচিতি দিয়ে থাকে। লিপিকরের বিবরণী সংযুক্ত পুষ্পিকা গ্রন্থের প্রথম ও শেষেই লিখিত হতো। অনেক সময় লিপিকরের কবিত্বগুণে পুষ্পিকা সুদীর্ঘও হতো।

পুষ্পিকার নমুনা (১ম পত্রের)

ওঁ নমো গণেশায় ॥
শ্রীকৃষ্ণচরণৌ নত্বা কারকাদ্যর্থনির্ণয়ঃ।
শ্রী ভবানন্দসিদ্ধান্তবাগীশেন বিতন্যতে ॥
শেষ পত্রের পুষ্পিকা:
ইতি শ্রীচৈত্যন্যমঙ্গলে শেষ খণ্ডঃ সম্পূর্ণঃ। ইতি সূত্রাদিমধ্য শেষখণ্ডঃ ॥ হরিঃ।

লেখক ও লিপিকরের সময় সম্পর্কে পুষ্পিকা অংশে গুরুত্বপূর্ণ অনেক তথ্য পাওয়া যায়। সেকালে পুঁথি পড়ার জন্য পাণ্ডুলিপি ধার দেয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল। পুঁথি চোরেরও অভাব ছিল না। পুষ্পিকায় অনেক লিপিকরই চোরের প্রতি সাবধানবাণী উচ্চারণ করে গালিগালাজ দিয়ে বলতেন,

'পুঁথি চুরি করে যে শূকর তাহার পিতা গাধা হয় সে' (বিশ্বভারতী পুঁথি-১৭৮)।

কোলকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সংগ্রহ শালায় একটি সংস্কৃত পুঁথির পুষ্পিকায়ও লেখা আছে,

যত্নেন লিখিতং গ্রন্থং যশ্চোরয়তি মানবঃ।
মাতা চ সুকরী তস্য পিতা গর্দ্দভঃ ॥

পুঁথি নকল শুভকর্ম বলে ধরে নেয়া হতো। তাই পুঁথি নকলের সমাপ্তিতেও তিথি প্রহর ইত্যাদির উল্লেখ পুষ্পিকায় লক্ষ্য করা যায়। যেমন-সন ১২২৫ সালে তাং ৮ আষাঢ় রোজ রবিবার তিথি কৃষ্ণপক্ষ তৃতীয় বেলা তিন প্রহরে সমাপ্ত লিখিতং (বিশ্বভারতী পুঁথি ১৩২২)। পুঁথি নকল করার জন্য দক্ষিণা দেয়া হতো।

লিপিকরপ্রমাদ

অন্যমনস্কতা অথবা দ্রুত লিখনের জন্য কোনো কারণে অনুলিখনে ভুল হয়। অন্যমনস্কতার কারণে কিছু কিছু চরণ এমনকি অনুচ্ছেদও বাদ পড়ে। আল বেরুণী তাঁর ভারততত্ত্ব গ্রন্থে লিখেছিলেন, "লিপিকরেরা অত্যন্ত অসাবধান, পাঠ মিলিয়ে শুদ্ধ নকল করতে যত্ন নেয় না। তার ফলে একটি বা দুটি নকলের পরেই গ্রন্থকারের গবেষণা পণ্ডশ্রমে পরিণত হয়, কারণ পুস্তকটি তখন এত অশুদ্ধিতে ভরে উঠে আর পাঠ এত বিকৃত হয়ে যায় যে দেশী বা বিদেশী কেহই তার অর্থ গ্রহণ করতে পারে না।"[১৭]

পুঁথি সংগ্রাহক

লিপিকরের হাতে লেখা পুঁথির মাধ্যমে অগণিত পাঠকের কাছে নীরবে নিভৃতে রচিত কাব্যচর্চা পৌঁছে গিয়েছিল। পুঁথি জীবন্ত প্রাণ প্রবাহের প্রতীক। রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহের সঙ্গে 'দৈত্যপুরিতে আটকে পড়া রাজকন্যা উদ্ধার' এর তুলনা করেছেন। এদেশে সরকারি প্রচেষ্টায় পুঁথি সংগ্রহের কাজ প্রথম শুরু হয় ১৮৬৮ খ্রি. এশিয়াটিক সোসাইটির উদ্যোগে। এদেশে পুঁথি সংগ্রহে বিশেষ অবদান ছিল হ্যালহেড, জনসন, কেরী ও লিডেনের নাম। পুঁথি সংগ্রহের ইতিবৃত্ত আলোচনায় লক্ষ্য করা যায় যে, গোড়ার দিকে প্রাচীন পুঁথি সংগৃহীত হয়েছে প্রয়োজনের তাগিদে-সাহিত্যানুরাগ বা অন্য কোনো প্রেরণায় নয়। প্রাচীন সাহিত্যের প্রতি অনুরাগবশত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নিজে কিছু পুঁথি সংগ্রহ করেছিলেন নিম্নে লেখা মূল্যে তিনি কয়েকটি প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করেছিলেন,

কাব্যাদর্শ : পাঁচসিকা।
মাঘটীকা : পাঁচসিকা

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পুঁথিশালায় নগেন্দ্রনাথ বসু সংগৃহীত পুঁথি ছাড়াও রবীন্দ্রনাথ ও দীনেশ চন্দ্র সেন প্রাচীন সাহিত্য সমিতির সদস্য হন। রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় প্রায় ২০০০টি বাংলা পুঁথি বিশ্বভারতীতে সংগৃহীত হয়। নগেন্দ্রনাথ বসুর সংগৃহীত পুঁথির অধিকাংশই বাঁকুড়া অঞ্চলের । ড. নলিনীকান্ত ভট্টশালী লেখকের একাদেশদর্শিতার অভিযোগ তুলে ধরেন।

আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ আজীবন অক্লান্ত পরিশ্রম করে বিপুল সংখ্যক পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেছেন।[১৮] বাংলা সাহিত্যের প্রতি অপরিসীম ভালোবাসা থেকে পুঁথি সংগ্রহ করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে ব্যোমকেশ মুস্তফীর স্বগতোক্তি, "তাঁহার অবস্থা ভালো নহে, তিনি বিশেষরূপে অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি। পুঁথি অনুসন্ধান করিতে গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইবার অবসর ও ব্যয় নির্বাহের মতো আর্থিক স্বচ্ছলতা তাহার নাই। মূল্য দিয়া পুঁথি ক্রয় করিতে পারেন এমন অর্থ তাঁহার নাই তথাপি মাতৃভাষার প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা, প্রীতি ও ভক্তিবশত তিনি জীবনের দীর্ঘকাল এই পুঁথি সংগ্রহে ব্যয় করেছেন।" আব্দুল করিম সংগৃহীত ৩৩৮ খানা পুথি রাজশাহী বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে।

দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর পরিচারক রামকুমার দত্তকে দিয়ে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের জন্য প্রায় ২ হাজার পুঁথি সংগ্রহ করে, ঢাকা মিউজিয়ামের কিউরেটর নলিনীকান্ত ভট্টশালী এবং বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগীয় প্রধান ড. সুশীল কুমার দে প্রায় ১৭০০০ বাংলা

ও সংস্কৃত পুঁথি সংগ্রহ করেন। কুমিল্লায় মহেশ ভট্টাচার্য তাঁর মাতার স্মৃতির স্বার্থে রামমালা রিসার্চ লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করেন। এই গ্রন্থাগারে বহু দুষ্প্রাপ্য পুঁথি সংরক্ষিত হয়েছে। মধ্যযুগের সাহিত্যবিষয়ক গবেষণার উদ্দেশ্যে ড. মুহাম্মদ এনামুল হক কিছু প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করেন। পরবর্তীকালে সে পুঁথিগুলো রাজশাহী বরেন্দ্র রিসার্চ ইন্সস্টিটিউটে দান করেন। তাঁর সংগ্রহের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে শাহ মুহম্মদ সগীরের ইউসুফ জোলেখার আত্মবিবরণী। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির গ্রন্থাগারে প্রায় দেড় সহস্রাধিক পুঁথি সংগৃহীত ছিল। বর্তমানে বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরে প্রায় পাঁচ হাজারের অধিক সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় লিখিত পাণ্ডুলিপি আছে। এর মধ্যে প্রায় সাড়ে তিন হাজার সংস্কৃত ভাষায় ও প্রায় দেড় হাজার বাংলা ভাষায় লেখা। উপকরণ হচ্ছে তুলট কাগজ, তালপত্র বা তেরেটপত্র এবং যন্ত্রনির্মিত উপাদান। বাংলাদেশের দ্বিতীয় পুঁথি সংগ্রহের ইতিহাসে এই সংরক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সংস্কৃত ও বাংলা উভয় ভাষায় লিখিত পুঁথিগুলোকে বেদান্ত, দর্শন, তন্ত্র, স্মৃতি, পুরাণ, কাব্য ছন্দ, নাটক, কোষ বা অভিধান, অলঙ্কারশাস্ত্র, বৈষ্ণবকাব্য, আয়ুর্বেদ, জ্যোতিষ, ইতিহাস, ব্যাকরণ, বৌদ্ধ, ন্যায়, পৌরাণিক, কামশাস্ত্র প্রভৃতিরূপে শ্রেণিকরণ করা হয়েছে। সংস্কৃত ও বাংলা পুঁথির প্রায় সবগুলোই বাংলা লিপি কৌশলে রচিত। সামান্য কিছু পুঁথি দেবনাগরি লিপিতে লেখা। ১৯৫৬ সালে মণীন্দ্র মোহন চৌধুরীর সম্পাদনায় বাংলা পুঁথির একটি তালিকা প্রকাশিত হয়। আম্বিয়া বাণী কাব্যের তিনটি পুঁথির কথা ড. মাজহারুল ইসলামের গবেষণা গ্রন্থে উল্লিখিত আছে।[১৯] ড. আহম্মদ শরীফ ও মুহম্মদ আবু তালিবের সংগ্রহে কিছু পুঁথি সংরক্ষিত ছিল।

আব্দুল করিমের পুঁথি-বিবরণ বিবৃতিমূলক (Descriptive) পুঁথির বিবরণ সংকলনের আর একটি পদ্ধতি হচ্ছে বিবৃতিবিহীন তালিকা প্রণয়ন। এ তালিকায় বিভিন্ন স্তম্ভ অনুসারে ক্রমিক সংখ্যা, গ্রন্থের নাম, গ্রন্থকারের নাম, পত্রসংখ্যা, বিষয়, লিপিকাল, প্রাপ্তিস্থান ইত্যাদির উল্লেখ থাকে। আলী আহমদ সংকলিত বাংলা কলমী পুঁথির বিবরণ এবং মণীন্দ্র মোহন চৌধুরী সংকলিত পুঁথির তালিকায় এ পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। জার্মান পণ্ডিত Aufrecht 'Catalogus Catalogorum' নামে পুঁথির ক্যাটালগ সম্পাদনা করেন। আলী আহমদ সংকলিত 'বাংলা কলমী পুঁথির বিবরণ'ও উল্লেখযোগ্য।

পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণ

আমাদের দেশে আর্দ্র ও স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া এবং ধুলোবালি পাণ্ডুলিপির সবচেয়ে বড় শত্রু। প্রাচীনকাল থেকেই পাণ্ডুলিপিকে মোটা করে মুড়িয়ে, কাঠের পাটা দিয়ে শক্ত করে বেঁধে রাখার রীতি প্রচলিত আছে। উন্নত দেশসমূহে পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণের জন্য আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরে পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণের জন্য শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। পাণ্ডুলিপি যাতে চিরতরে বিনষ্ট না হয়ে যায় সেজন্য পাণ্ডুলিপি মাইক্রোফিল্ম অথবা স্ক্যানিং করে রাখার ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। ডিজিটালাইজডও করা হচ্ছে। পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে একটি প্রবাদ আছে,

যত্নে থাকবে পুত্রের মতো।
বাঁধতে হবে শত্রুর মতো।

প্রাচীন বাংলায় লেখা পুথিপাঠে সক্ষম প্রাবন্ধিক, গবেষক মুহাম্মদ শামসুল হক এর মন্তব্য- পুঁথি সংরক্ষণ শুধু অতীতের প্রতি মুগ্ধতা না, এ অঞ্চলের মুগ্ধতার ইতিহাস জানার একমাত্র লিখিত রূপ। মধ্যযুগের কবি সাহিত্যিকদের সাহিত্যকীর্তি জানা যায় পুঁথি থেকেই। বাংলা একাডেমিতে সংরক্ষিত পুঁথিগুলো বহু বছর ধরে অনেক পরিশ্রমের সংগ্রহ। এই সম্পদ রাষ্ট্রের।

বিশিষ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ পুঁথি

পুঁথির বয়স প্রায় হাজার বছর। নাম 'অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা' Perfection of Wisdom in eight thousands Lines' পরিপূর্ণ জ্ঞানের আট হাজার পঙ্‌ক্তি। সংস্কৃত 'অষ্ট' শব্দের অর্থ আট এবং 'সাহস্রিকা' শব্দের অর্থ হাজার। 'প্রজ্ঞা' অর্থ জ্ঞান ও পারমিতা অর্থ কর্তব্যসম্পর্কিত জ্ঞান। রাজশাহীর লোকনাথ উচ্চ বিদ্যালয়ের সংস্কৃত পণ্ডিত সচীন্দ্রনাথ সিদ্ধান্ত ১৯৭৯ সালে বরেন্দ্র জাদুঘরের সংস্কৃত ক্যাটালগ গ্রন্থ প্রস্তুত করেন। এর মধ্যে ক্যাটালগ ৬৮৯ ও ক্যাটালগ ৮৫১ এ দুটি পুঁথি অষ্টসাহস্রিকা ও প্রজ্ঞাপারমিতা। বৌদ্ধ মহাযান মহাবলম্বীদের ছয়জন দেব-দেবীর রঙ্গিন ছবি এ পুঁথিতে আকা আছে। পুঁথির পাতাগুলো ৩১.৫০×৬.৩০ সেন্টিমিটার আকারের। ৫৩১টি পাতায় সম্পূর্ণ এ পুঁথির ৫১৯টি পাতা বর্তমানে বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। ১২টি পাতা নিরুদ্দিষ্ট। এই পুঁথিতে কয়েকটি দেবমূর্তির চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। ছবিটি ১৬ শতকে লিওনার্দো দা ভিঞ্চির আঁকা মোনালিসার হাসির সঙ্গে বিষন্নতা মেশানো অমর সৃষ্টির কথা মনে করিয়ে দেয়। এ অমূল্য শিল্পের সন্ধান কে দিয়েছিলেন তা কোথাও লেখা নেই। তবে কুমার শরৎকুমার রায় নিজ অর্থ ও জনবলে রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া, দিনাজপুর, ময়মনসিংহ, ঢাকা, কুমিল্লা এমনকি বেনারস ও মথুরা থেকেও পুথি সংগ্রহ করে নিয়ে আসেন।

রাজশাহী বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরে সংরক্ষিত পুঁথির নমুনা

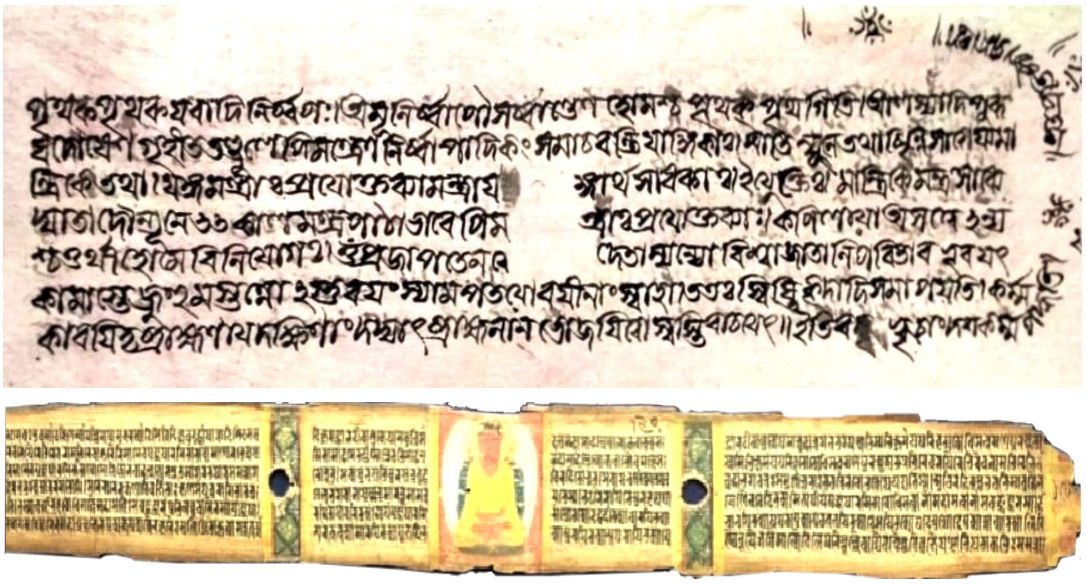

রাজশাহী কলেজ গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত পুঁথির নমুনা

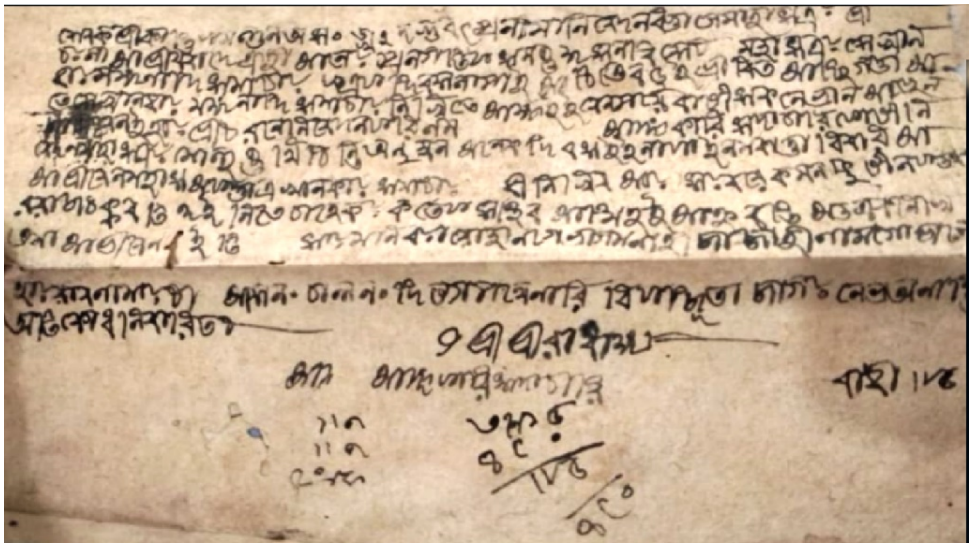

পুঁথির গুরুত্ব

পাণ্ডুলিপিবিদ্যা অর্থে Manuscriptology শব্দটি ব্যবহৃত হয়। Manuscript অর্থ হাতে লেখা গ্রন্থ এবং Ology অর্থ অধ্যয়ন, এই দুই শব্দের সমন্বয়ে Manuscriptology, বাংলায় একে পাণ্ডুলিপিবিদ্যা বলে। পাণ্ডুলিপিবিদ্যা কেবল অতীতের নিদর্শন সংরক্ষণের বিদ্যা নয়। এটি মানবসভ্যতার বুদ্ধিবৃত্তিক ঐতিহ্যকে ভবিষ্যতের জন্য রক্ষা করার একটি গুরুত্বপূর্ণ শাস্ত্র। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে পুঁথি শব্দ ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। মানুষ মাত্রই নতুনের খোঁজ করে পুরনো জিনিসটাকে ছুঁড়ে ফেলে। পুরনো বা প্রাচীন মানেই যে ফেলনা তা তো নয়। মহাকালের নিদর্শন হিসেবে যেমন এসবের তাৎপর্য আছে তেমনই গুরুত্ব আছে আবেগঘন স্মৃতিনিদর্শন হিসেবে। মধ্যযুগের প্রাচীন ইতিহাস জানার জন্য পুঁথির গুরুত্ব অনেক- কারণ এর মধ্যে রয়েছে প্রাচীন সভ্যতার ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস, শৈল্পীসত্তা। পাঁচালি বা লোকগীতির মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে প্রাচীন জনজীবনের ইতিহাস। ধর্মীয় পুঁথি ভাগবতপুরাণ, সত্যপীরের পুঁথি, বৌদ্ধমঠে বজ্রযানী ধারা থেকেও পুঁথির গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়। সমাজ, সংস্কৃতি, নৃতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব,লিখনপদ্ধতি, মনস্তত্ত্ব সবই পুঁথিতে আলোচিত হয়েছে। পুঁথির পাঁটাচিত্র অঙ্কনশৈলী, লিখনশৈলী হরফ লিখনেও পুঁথির ভূমিকা অপরিসীম। পুঁথি পড়া শেখার পাশাপাশি পুঁথি সম্পাদনার বিষয়টি গবেষকদের শেখা আবশ্যক। তাহলে প্রাচীন ইতিহাসের রহস্য উন্মোচিত হবে।

উপসংহার

উপসংহার অর্থই হচ্ছে ইতি টানা। পুঁথির আলোচনার সমাপ্তি লেখা যায় না। পুঁথি যেহেতু জ্ঞানের ভাণ্ডার- শিল্প, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ধারক তাই এই সম্পদকে গোয়ালঘরের মাঁচায় বা কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তির সংগ্রহশালায় না রেখে সংরক্ষণ ও প্রচারের মাধ্যমে উন্মুক্ত করে দিতে হবে। জাতীয় পর্যায়ে পুঁথি পাঠের কর্মশালার আয়োজন করতে হবে। তবেই পুঁথির জরাজীর্ণ পাতা জ্ঞানাকাশে উন্মুক্ত বিহঙ্গের মতো ডানা মেলে উড়ে বেড়াবে। পুঁথি আমাদের রাষ্ট্রীয় সম্পদ একথা বিস্মৃত হলে চলবে না। এর যথাযথ সংরক্ষণ অত্যাবশ্যক। সংরক্ষণের জন্য প্রযুক্তির যুগে অনেক উপায় আছে। সরকারি পর্যায়ে এব্যাপারে উদ্যোগ নিতে হবে। স্ক্যানিং, শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র ও তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র ব্যবহার করলে আবহাওয়াজনিত বিপদ থেকে পুঁথিগুলো রক্ষা করা সম্ভব।

তথ্যনির্দেশ

১ শ্রী পঞ্চানন মণ্ডল, *পুঁথি পরিচয়*, ১ম খণ্ড, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ, পৃ, ৭-৯।

২ Georg Bűhler, *Indian Paleography*, Calcutta, Munshiram Manoharlal Publishers, 1962, P.145.

৩ J. Mrshall, *Mohenjo-Daro and the Indus Civilization,* Vol-1, 41 Great Russell street, London,1931, P. 40.

৪ নির্মল দাশ, *মধ্যযুগের কাব্যপাঠ*, পশ্চিমবঙ্গ, ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানি, ১৩৮৬ বঙ্গাব্দ, পৃ-১।

৫ পঞ্চানন মণ্ডল, *পুঁথি পরিচয়*, ১ম খণ্ড, ভূমিকা, *পূর্বোক্ত*, পৃ-৮।

৬ সরসীকুমার সরস্বতী, *পালযুগের চিত্রকলা*, কলিকাতা,আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৭৮, পৃ. ৩১২।

৭ সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, পূর্বার্ধ, ৪র্থ সংস্করণ, কলিকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৬৩, পৃ.৪১৪।

৮ তোফায়েল আহমেদ, *আমাদের প্রাচীন শিল্প*, ঢাকা, ১৯৬৪, পৃ. ১২৫।

৯ অতুল সুর, *কাগজ ও কালি*, দুই শতকের বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন, ১৯৮১, পৃ.৪০১।

১০ পঞ্চানন মণ্ডল, *পুঁথি পরিচয়*, ১ম খণ্ড, *পূর্বোক্ত*, পৃ.১৯০।

১১ সুশীল কুমার দে, *বাংলা প্রবাদ*, কলিকাতা, এ. মুখার্জী এণ্ড কোঃ লিঃ, ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ, পৃ.২৩৯।

১২ *A General Guide to Dacca Museum*, Dhaka, 1964, P.48.

১৩ মু. শাহজাহান মিয়া, *পদ্মপুরান*, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ.৩৬৬।

১৪ নির্মল দাশ, *মধ্যযুগের কাব্যপাঠ*, *পূর্বোক্ত*, পৃ-৬।

১৫ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, *বাংলা সাহিত্যের কথা*, ২য় খণ্ড, ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, পৃ. ২৪২।

১৬ যতীন্দ্র সেন, *বিভিন্ন অব্দ বা বর্ষগণনা*, আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ।

১৭ আবু মহাম্মদ হাবিবুল্লাহ্ (অনূদিত), *আলবেরুণীর ভারততত্ত্ব*, ঢাকা, ১৯৭৪, পৃ-৬।

১৮ আহমেদ শরীফ,*আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ সঙ্কলিত পুঁথি পরিচিতি*,বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৮।

১৯ ড. মাযহারুল ইসলাম, *কবি হেয়াত মামুদ*, ঢাকা, ১৯৬৯, ভূমিকা, পৃ-৭৩।

বাংলা পুঁথির তালিকা

বাংলা : পত্র-পত্রিকা

১ আনন্দ বাজার পত্রিকা- ৮ বৈশাখ, ১৩৫৮।

২ বাংলা একাডেমী পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র, ১৩৬৮, ১৩৭৪।

৩ বিশ্বভারতী পত্রিকা- শ্রাবন-আশ্বিন, ১৩৫৫।

বাংলা : পুঁথি

১ ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরির (লন্ডন) পুঁথি নং-S2144

২ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি ক্রমিক সংখ্যা ৪৭৬, ৪৭৭, ৪৬১

৩ রাজশাহী কলেজ গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত পুঁথি।

৪ রাজশাহী বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত পুঁথি।